Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501011

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

The Reflection of Indigenous Indian Thought in the Bengali Novel
বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতিফলন

Dr. Amal Modak
Associate Professor
Bengali Department
Sripat Singh College

Received on: 18th January 2026
Accepted on: 20th February 2026

Abstract:
Indigenous societies possess a distinct knowledge system, uniquely suited for sustaining life in harmony with nature. This encompasses herbal medicine, agricultural practices, environmental stewardship, and social customs. Indigenous peoples share an intimate bond with nature, and their way of life is intrinsically dependent upon it. Their ongoing struggle to safeguard their rights to land and nature constitutes a matter of paramount importance. Spirituality exerts a profound influence on indigenous culture, shaping their philosophy of life, ethical framework, and relationship with the natural world. Indigenous languages and cultures serve as the custodians and conduits of their identity and heritage. The extinction of a language inevitably leads to the disruption of the continuity of knowledge and culture. Consequently, it is imperative to take concrete measures to preserve and foster indigenous languages and cultures. The primary objective of the Indian Knowledge System is to recognize the significance of the traditional knowledge, totems, taboos, and lifestyles of the indigenous populations residing in India, and to integrate these elements into the broader fabric of Indian society. With this context in mind, the central theme of this essay will be to explore the extent to which indigenous Indian thought has been reflected in Bengali novels.

Key Words:
Indigenous Society, Knowledge Systems, Herbal Medicine, Cultural Preservation, Traditional Knowledge, Totems and Taboos.

মূল প্রবন্ধ

ইংরেজি ‘ট্রাইব’ শব্দের ভারতীয়করণ করা হয়েছে আদিবাসী, জনজাতি, উপজাতি ইত্যাদি শব্দবন্ধ দ্বারা। ট্রাইবের পরিবর্তে ‘আদিবাসী’ শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৩২ সালে ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের শুরুতে ‘আদিবাসী’ শীর্ষক পত্রিকায়। আদিবাসী শব্দটির অর্থ হলো দেশের আদিম বাসিন্দা তথা মূলনিবাসী। আদিম অধিবাসী অর্থে ‘আদিবাসী’ শব্দের ব্যবহার নৃতাত্ত্বিকেরা সকলেই স্বীকার করেছেন। ভারতবর্ষে আদিতে বসবাসকারী মানুষই হলেন ভারতের আদিবাসী। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী Joshep Troisi উল্লেখ করেছেন প্রাচীনকাল থেকেই

© Santiniketan Sahityapath

ভারতবর্ষে বিপুল সংখ্যক জাতিগোষ্ঠী ও সংস্কৃতির আবাসভূমি ছিল। এই জাতিগোষ্ঠীগুলিকেই দেশের প্রাচীনতম অধিবাসী বলে মনে করা হয় এবং তারা বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে, এর মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত শব্দটি 'আদিবাসী'। তাঁর কথায়:

"Since pre-historic times, India has been the homeland of a large number of ethnic groups and cultures. These communities, believed to be the earliest inhabitants of the country, are known by various names, the most extensively known term being Adivasi"[১]

প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ মর্গ্যান লিখেছেন আদিবাসী হচ্ছে কোনো স্থানে স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাসকারী আদিমতম জনগোষ্ঠী যাদের উৎপত্তি, ছড়িয়ে পড়া এবং বসতি স্থাপন সম্পর্কে বিশেষ কোনো ইতিহাস জানা যায় না। তবে তারা বিশেষ কোনো অঞ্চলের আদি ও অকৃত্রিম ভূমিপুত্র। তাঁর কথায়:

"The Aboriginals are the groups of human races who have been residing in a place from time immemorial... they are the true sons of the soil..."[২]

পণ্ডিত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার উল্লেখ করেছেন আদিবাসীরা কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি অর্থাৎ একগোষ্ঠীর পরিবারের মানুষ। এরা নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাসকারী ও একই ভাষায় কথা বলে থাকে। এদের বিবাহ, পেশা ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ, বাধ্যবাধকতা ও আদানপ্রদানের মধ্যে সামঞ্জস্য বা একরূপতা আছে।[৩]

অধ্যাপক প্রবোধ ভৌমিক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মধ্যে কৌমজীবনের একরূপতা লক্ষ করেছেন। তিনি লিখেছেন:

"আদিবাসীরা মূলত জীবনাবদ্ধ। আদিবাসীদের ধর্ম ও ভাষায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এজন্য এরা নিজেদেরকে এক বিশেষ গোষ্ঠী বলে মনে করে। এদের জীবনে অর্থনৈতিক মান অতিনিম্ন, পেশায় বিশেষায়ণ সম্ভব হয়নি।"[৪]

আদিবাসী-চিন্তক বিমলেন্দু মজুমদার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিশেষ কতকগুলি প্রলক্ষণের ভিত্তিতে আদিবাসী বা ট্রাইবাল হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীকে। তাঁর মতে, এই বিশেষ জনগোষ্ঠী 'দলবদ্ধভাবে নির্দিষ্ট একটি ঐতিহ্যবাহী পেশা অবলম্বন করে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় বসবাস করেন' এবং এই বিশেষ জনগোষ্ঠী 'নিজেদের শিল্পকলা, ভাষা-সংস্কৃতি, লোকাচার, লোকবিশ্বাস নিষ্ঠার সঙ্গে পালনের মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করেন।'[৫]

কথাসাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ আদিবাসী বলতে 'আদিম অধিবাসী'কে বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি মনে করেন: '... সাধারণত যাঁদের আদিম অধিবাসী (Aborigines) বলা হতো, আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষায় তাঁদেরই আদিবাসী বলা হয়েছে।'[৬]

ভারতবর্ষের মূলনিবাসী সকলেই আদিবাসী। আদিবাসী সমাজের ইতিহাসকার ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে মনে করেন: 'আর্যপূর্ব ভারতের আদিম বাসিন্দা তারাই। আর্যদের ভারতে আগমন ও বসতি বিস্তারের ফলে তারা বনে-জঙ্গালে, পাহাড়-পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। আর্যরা তাদের নিজের বসতস্থল থেকে বিতাড়িত করে।'[৭]

ভারতবর্ষের আদিবাসীরা সাংস্কৃতিকভাবে স্বতন্ত্র একটি জাতিগোষ্ঠী, যারা প্রাচীনকাল থেকেই এই দেশের নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল ও পরিবেশে বসবাস করে এসেছে এবং নিজেদের মতো করেই অরণ্যনির্ভর সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে তুলেছে।

২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতের আদিবাসীদের সংখ্যা ১০ কোটি ৪৫ লক্ষ, যা দেশের জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ। ভারতে ৭০৫টি আদিবাসী জনগোষ্ঠী আছে এবং তাঁরা ছড়িয়ে আছেন তিরিশটি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে। এর মধ্যে ৮০ শতাংশই মধ্য, মধ্য-পশ্চিম ও পূর্ব-ভারত জুড়ে। গুজরাট ও রাজস্থান থেকে শুরু করে মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং আসামে তাঁদের বিস্তার। বাকি ২০ শতাংশ উত্তর-পূর্বের মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল প্রদেশ, সিকিম এবং কেন্দ্রশাসিত দাদারা ও নগর হাভেলী, আন্দামান ও নিকোবর এবং লাক্ষাদ্বীপের বাসিন্দা। ১৯৫২ সালের 'উপজাতি উন্নয়ন কমিশন'এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের আদিবাসীরা অধিকাংশই অরণ্যবাসী ও পার্বত্যবাসী; তাদের ভাষা উপজাতীয়, ধর্ম ও ঈশ্বর ভাবনায় ভূত-প্রেত পূজক, জড়োপাসক; জাতিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে আদি-অস্ট্রেলীয়, মঙ্গোলাকার বা নিগ্রবটু; আদিম উৎপাদন ব্যবস্থানির্ভর কৃষিজীবী, শিকারজীবী ও খাদ্য-সংগ্রাহক জনগোষ্ঠী।[৮]

© Santiniketan Sahityapath

নৃতাত্ত্বিক বিরজাশঙ্কর গুহ শারীরিক নৃতত্ত্ব (Physical Anthropology)এর দিক দিয়ে ভারতের আদিবাসী সমাজকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই তিনটি বিভাগ হলো:

১. প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid)
২. নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো (Negrito)
৩. মঙ্গোলীয় (Mongoloid)

মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর আবার দুটি বিশিষ্ট উপবংশ কল্পনা করা হয়েছে:

১. আদি-মঙ্গোলীয় (Palae-Mongoloid)
২. তিব্বতী-মঙ্গোলীয় (Tibeto-Mongoloid)।[৯]

সমগ্র মধ্য ও দক্ষিণ-ভারতের আদিবাসী প্রধানত প্রোটো-অস্ট্রালয়েড বা আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। শুধু তাই নয়, পশ্চিম ভারতের আদিবাসীরা এবং গঙ্গা উপত্যকাবাসী নিম্নশ্রেণির হিন্দুরাও আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠীর মানুষ। মধ্য-ভারতের মালভূমিবাসী কোল, ভীল, বড়াগা, কোরোয়া খারোয়ার, মুণ্ডা, ভূমিজ এবং মাল পাহাড়িয়া এরা সকলেই আদি-অস্ট্রেলীয় গোষ্ঠী। দক্ষিণ ভারতের চেঞ্চু, কুরুম্বা, ইয়েরুবা ইত্যাদিও আদি-অস্ট্রেলীয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে নিগ্রোবটু গোষ্ঠীর মানুষের বসবাস ছিল বলে মনে করা হয়েছে। তবে ঠিক কবে তারা এসেছিল তা বলা যায় না। বর্তমানে ভারতবর্ষে তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। তারা অন্যান্য গোষ্ঠীর সঙ্গে একদেহে লীন হয়ে গেছে। আসামের আদিবাসীদের মধ্যে আদি-মঙ্গোলীয়দের সংখ্যা বেশি। চট্টগ্রামের চাকমারাও আদি-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর। সিকিম ও ভুটানের অধিবাসীরাই তিব্বতী-মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর খাঁটি নিদর্শন। হিমালয়ের উত্তরে বহুদূর বিস্তৃত অঞ্চলে এবং নেপালেও তিব্বতি-মঙ্গোলীয়ের অস্তিত্ব বর্তমান রয়েছে। মণিপুরী, তিব্বতী, লেপচা, বোড়ো, গুরুং, গারো, টোটো, ডুকপা, মেচ ও রাভা ইত্যাদি জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত। অধিকাংশ নৃতাত্ত্বিক একমত হয়েছেন যে নিগ্রোবটু বা নেগ্রিটো গোষ্ঠীই ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী। এরা মূলত বেদ্দিক কুলগত।[১০] নৃতাত্ত্বিকদের মতে এরাই ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক।

২

সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের (Cultural Anthropology) দিক দিয়ে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জীবনবৃত্তের বিভিন্ন স্তরেই দীর্ঘ ও প্রবহমান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আছে। এই ঐতিহ্যের বিকাশ ও সমৃদ্ধিতে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস, ট্যাবু-টোটেম, খাদ্যাভাষ, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, জীবনযাত্রার নানাধরণ ও দেশীয় ঐতিহ্যের নানারূপ লক্ষ করা যায়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে এক-একটি উৎসবের মূলে রয়েছে লৌকিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা আর্য-ভারতের আভিজাত্যের কারণেই উদাসীন ও অবজ্ঞাত থেকে গেছে। যদিও এই জনগোষ্ঠী বিস্ময়কর ভাবে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজ, লোকাচার ও ধর্মবিশ্বাস এখনো পর্যন্ত এক স্বতন্ত্র বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছে। ভারতীয় জ্ঞান-পরম্পরা (ইন্ডিয়ান নলেজ সিস্টেম)র উদ্দেশ্য হলো ভারতে বসবাসকারী আদিবাসী জনগণের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান, বিশ্বাস, এবং জীবনপদ্ধতির গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং ভারতীয় জ্ঞানচর্চার সঙ্গে তাকে সমন্বিত করা। আর্য-ভারত মূর্তিপূজার অনুসারী আর আদিবাসী-ভারত প্রকৃতির পূজারী। অরণ্যবেষ্টিত জীবনযাপনে আদিবাসীরা অভ্যস্ত। প্রকৃতির সান্নিধ্যেই তাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। প্রকৃতি তাদের রক্তে, প্রকৃতি তাদের ধর্ম-সংস্কৃতিতে। আদিবাসী সমাজের নিজস্ব একটি জ্ঞানচর্চা রয়েছে যা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গাতিপূর্ণ। আদিবাসীরা গাছ কাটে না, কাউকে গাছ কাটতে দেয় না। জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করে না, কীটনাশক ব্যবহার করে না। পরিবেশের ভারসাম্যের কথা মাথায় রেখে তারা পতিত জমিতে কিংবা নেড়া পাহাড়ে বৃক্ষ রোপণ করে। বুদ্ধদেব গুহর 'গামহারডুংরি' (১৯৬৬) উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের অরণ্যপ্রীতির কথা বলা হয়েছে। তমাল ও বুধাইরা গাছ লাগিয়ে নেড়া পাহাড়কে সুসজ্জিত করে তুলছে। উপন্যাসে উল্লেখ দেখি: 'গামহারডুংরীতে অনেক গাছগাছালি তমালদা এবং বুধাইরা ঋদ্ধিরা আসার আগেই লাগিয়েছিলেন। তবে এই নতুন টাড়ে গাছ এখন লাগানো হচ্ছে। আশেপাশের মুণ্ডারিদের গ্রামে অনেক চারা দিয়েছেন তমালদা। তারাও লাগিয়েছে সেসব গাছ। পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগ যাকে 'সামাজিক বনসৃজন' বলেন, তাইই। আম কাঁঠাল, পেয়ারা, জাম, আরো অনেক প্রয়োজনের গাছ — ফুলবাহী গাছ। সেইসব ফল পাখিরাও খাবে, মানুষেরাও খাবে।'[১১] জীবন-জীবিকার প্রশ্নে আদিবাসী সমাজ প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল। বন থেকে তারা শাকপাতা, ফলমূল এমনকি কাঠ, পাতা, গুগলি-শামুক সংগ্রহ করে। নদী থেকে তৃষ্ণার জল শুধু তারা সংগ্রহ করে না

© Santiniketan Sahityapath

তার পূজাও করে। শক্তিপদ রাজগুরুর 'শালপিয়ালের বন' (১৯৫৪) উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছে সেকথা: 'বন থেকেই তারা আহরণ করে তাদের ক্ষুধার অন্ন, বনজ ফল আর মাংস; তাদের পানীয় ঝরণার ক্ষীরধারা — তাদের জীবনদাত্রীরূপিণী মা... তাঁর পূজাও করে ওরা।'[১২]

প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার ভাবনা থেকেই তাদের জীবনদর্শনে এসেছে 'দেবত্ববাদ'। আদিবাসী জীবন ও সংস্কৃতিতে প্রকৃতি যেন বোঙ্গা-বুরু বা জীবনদেবতা। আদিবাসী ধর্মবিশ্বাসে গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি যেন দেবদেবী প্রেরিত জীবন্ত দূত। জীবজগতকে সঙ্গা দেওয়ার জন্যেই যেন তাদের আগমন। আদিবাসী সংস্কৃতিতে বট, অশ্বত্থ, নিম ও শাল গাছ আবহমান কাল ধরে পূজিত হয়ে আসছে। তাদের উপাসনা জড়োপাসনা বলে পরিচিত। আদিবাসীরা গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি, নদ-নদী, পাহাড়, পশু-সহ ভূমি, বৃষ্টি, চন্দ্র ও সূর্যকে দেবতা মনে করে এবং তাদের সন্তুষ্ট করতে বলিদান প্রথাকে অপরিহার্য বলে মনে করে। আদিবাসী সমাজে বৃক্ষপূজা, পাথরপূজা, মহামাতার কল্পনা, বলিদান প্রথা, দেবতুষ্টি বা দেবতার কোপশান্তি প্রথা, সাকার দেবতার কল্পনা, টোটেম পূজা, উর্বরতা পূজা, মৃত পূর্বপুরুষের পূজা ইত্যাদির প্রচলন আছে।[১৩]

আদিবাসী ধর্ম-সংস্কৃতিতে মূর্তিপূজার স্থান নেই। আদিবাসীদের কাছে গাছ কুলদেবতা স্বরূপ। তারা বিশ্বাস করে গাছ থাকলে পরিবেশের ভারসাম্য অটুট থাকে; বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক হয়। কৃষিকাজ অব্যাহত থাকে। ভূ-গর্ভস্থ জলস্তর একই রকম থাকে। পাহাড়-পাড়-পগার থাকলে গাছ লতাপাতা আপনা থেকেই উদ্ভূত হয়। ভূমিক্ষয় রোধ করে। আধুনিক পরিবেশবাদী চিন্তাধারায় একে 'ইকোলজি' বলে। 'সাসটেইনবেল ডেভেলপমেন্ট' বলে। বুদ্ধদেব গুহর 'গামহারডুংরি' উপন্যাসে এই 'ইকোলজি' ধ্বংসের বিষময় পরিণতির কথা সুন্দর করে বলা হয়েছে: 'ইকোলজির এমন সর্বনাশ তো আগে হয়নি কখনও। হিমবাহ গলে যাচ্ছে, অমরনাথের শিবলিঙ্গা গলে যাচ্ছে, চারিদিকে বন্যা, ভূমিকম্প। আমার পিসি কানাডার মনট্রিয়াল থেকে কলকাতাতে লিখেছেন যে এবছরে সেখানে নাকি চল্লিশ ডিগ্রি গরম। অভাবনীয়। এসবই আমাদেরই কৃতকর্মের ফল।'[১৪]

আদিবাসী সংস্কৃতিতে প্রকৃতির প্রধান পুরুষ 'ধরমেশ' বা ধর্মঠাকুর হলেন সৃষ্টিকর্তা। তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' (১৯৫৭) উপন্যাসে দেখা যায় উত্তর-পূর্ব ভারতের পার্বত্য অঞ্চলের নাগা উপজাতি মানুষদের জীবনযাপনের সঙ্গে সূর্যদেবতার কাহিনি জড়িয়ে রয়েছে। আদিবাসী ধর্ম-সংস্কৃতিতে সূর্যদেব সিং-বোঙা রূপে পূজিত। 'সিং' বলতে দিন আর 'বোঙা' অর্থে দেবতা। দিনের বেলায় আসেন তাই তিনি 'দিনদেবতা' আর রাতে আসেন তাই 'চাঁদো' বা 'চন্দ্রদেবতা'। চাঁদের গুরুত্ব পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষদের কাছে খুব একটা নেই বললেই চলে। শীতপ্রধান অঞ্চলের লোকেদের কাছে সূর্যদেব আশ্চর্য শক্তির আধার। সূর্যদেব-বৃত্তান্ত আদিবাসী গান, কথা-উপকথায় মোহিত হয়ে আছে। 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসে এর প্রতিফলন ধরা পড়েছে। উপন্যাসের বর্ণনায় রয়েছে: 'এমন করে আকাশের ছটা দরজায় ছবার চেঁচিয়ে উঠল মুরগী। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও তার প্রতিজ্ঞা মত এসে হাজির। একসময় পাহাড়ের লোকেরা দেখলে ছয় আকাশ ডিঙিয়ে সূর্য এসে উঠেছে পাহাড়ের উপর। আলোয় ভরে গিয়েছে চারিদিক। শীত পালিয়েছে। সেই থেকে আজও সেই মুরগীটা আকাশে ছবার ডেকে ওঠে। ছয় আকাশের দরজায় দাঁড়িয়ে ছবার ডাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমরা শুনি। তারপর এ পাহাড়ে সূর্য আসে।'[১৫]

আদিবাসী লোকবিশ্বাসে উৎসব-অনুষ্ঠানের একটি আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। 'করম' পরব বা 'জাওয়া' পরব হলো এমনই একটি পরব যা আসলে বৃক্ষ পূজারই অনুষ্ঠান। আদিবাদী সমাজ শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও রক্ষাকল্পে এবং অপদেবতার হাত থেকে রেহাই পেতে করম রাজাকে পূজা করে। অনুষ্ঠানের দিন দুটি করম ডাল এনে পুঁতে রাখা হয় যা করম ঠাকুর বা ধরম ঠাকুর মান্যতা দিয়ে সন্ধ্যেবেলায় পূজা করা হয়। পূজা শেষ হলে করম রাজার মাহাত্ম্য কাহিনি ব্যাখ্যা করা হয়। এরপর সারারাত ধরে নাচ গান চলে। শক্তিপদ রাজগুরুর 'শালপিয়ালের বন' (১৯৫৪) উপন্যাসে এই করম পূজার কথা পাওয়া যায়। উপন্যাসে বর্ণিত আছে: ''কারাম আও বা বৃক্ষরোপন' উৎসব তাদের সামাজিক থেকে সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গা হয়ে রয়েছে। নতুন বর্ষার কালো মেঘস্তুপ পাহাড়ের গায়ে মত্ত মাতঙ্গোর মত লুটোপুটি শুরু করে... গড়িয়ে পড়ে এ-ওর গায়ে, হঠাৎ ক্ষেপে ওঠা দমকা হাওয়ার গতিতে কোথায় যেন পার্বতের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে...। বৃষ্টির ধারাপাতে আকাশের মেঘগর্জনে কেঁপে ওঠে বনপর্বত রাজ্য।... এমনি দিনে ওরা ছেলেমেয়ে সেজেগুজে মাদলের শব্দে ভরে তোলে বর্ষার সজল মেঘমেদুর পরিবেশ। বৃক্ষরোপণ করে তারা সাদর আহ্বান জানায় শ্যামগম্ভীর বর্ষাকে।''[১৬]

© Santiniketan Sahityapath

নারায়ণ সান্যালের 'দণ্ডক-শবরী' (১৯৬২) উপন্যাসে 'চৈতডাণ্ডা' নামে এক উৎসব-অনুষ্ঠানের কথা পাওয়া যায়, যা আদপে বৃক্ষপূজার অনুষ্ঠান। এটি চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে দণ্ডকারণ্যের মুড়িয়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষেরাআনন্দে মেতে ওঠে। আর আছে 'উইজ্জা' উৎসবের কথা। প্রতি বছর বীজ বপনের সময় এলেই পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষেরা এই উৎসবে মেতে ওঠেন। শুধুমাত্র পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী মানুষেরা নয়, গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যেও এই উৎসব 'রুনহি' পার্বণ নামে প্রচলিত আছে। এই উৎসবের সঙ্গে শস্য বা ফসলের যোগ রয়েছে। দেবী লক্ষ্মী ধান গাছ বা ধানের শিষের প্রতীকে পূজিতা হয়। এই বিশেষ দিনে মাঠে বীজ ছড়ানোর কাজ শুরু হয়। 'বছর ঘুরে আবার এল 'উইজ্জা-পাণ্ডাম' মাস। চৈত-দাণ্ডার পরব এল, গেল। মহুয়া ফুল আর তেন্দুপাতা সংগ্রহের মাস এল, গেল। তারপরেই 'উইজ্জা' উৎসব। মাঠে বীজ ছড়াবার শুভলগ্ন। বীজ বোনার আগে ওরা একটা বাৎসরিক শিকার অভিযানে বার হয় 'উইজ্জা-ওয়েতা' শিকারে।"[১৭]

আদিবাসী সমাজে নারীকেন্দ্রিক নানাধরণের ট্যাবু বা সামাজিক বিধি-নিষেধ প্রচলিত আছে। প্রফুল্ল রায়ের 'পূর্বপার্বতী' উপন্যাসে 'মৃগয়াকেন্দ্রিক' এই রকম একটি ট্যাবুর উদাহরণ উল্লেখ করা যাক উপন্যাসের আখ্যান থেকে: "শিকারের আগে রাতে নাগারা স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শোয় না। যারা অবিবাহিত, তারা শুয়োর হত্যা করে না। এ রাতটা তাদের কঠোর শুচিতা দিয়ে ঘেরা। শিকারিরা এ রাতে গ্রামের মোরাঙে এসে বিছানা বিছায়। তাদের বিশ্বাস, কলুষিত দেহমন নিয়ে শিকারে বেরুলে অসফল হয়ে ফিরতে হয়।"[১৮] তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) উপন্যাসে কাহার জনগোষ্ঠীর জীবন-মরণের প্রশ্নে জড়িয়ে আছে কুলদেবতা সর্পের শিষধ্বনি। তাদের বিশ্বাস গভীর রাত্রে ঘন জঙ্গালের ভিতর থেকে যে শিসধ্বনির আওয়াজ শোনা যায় তা আর কারও নয় তা কাহার জনজাতির কুলদেবতা সর্পের শিসধ্বনি। "হাঁসুলীবাঁকের ঘন জঙ্গালের মধ্যে রাত্রে কেউ শিস দিচ্ছে। দেবতা কি যক্ষ কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে কাহারেরা।"[১৯]

ভূমি ও প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য আদিবাসীদের সংগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' (১৯৩৭) উপন্যাসে যুগলপ্রসাদ পোড়ো জমিতে গাছ লাগায়, বীজ বপন করে। বুদ্ধদেব গুহর 'গামহারডুংরি' (১৯৬৬) উপন্যাসের চাটান প্রকৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার কাজে সংকল্প গ্রহণ করে। পরিবেশের ক্ষতি করে যারা প্রকৃতির অনিষ্ট করে তাদের উদ্দেশ্যে চাটান বলে, "মানুষের এই লোভও সর্বগ্রাসী। তোরা সবাই দেখে নিস মুণ্ডাদের ওই 'খুম্বুরু-জুম্বুরি'ই অবশেষে কাল হবে আমাদের। প্রকৃতিকে এইভাবে ধর্ষণ করার শাস্তি তাকে পেতেই হবে। সব গাছ কেটে ফেলা, নদীর বুক থেকে পাথর তুলে নিয়ে তাকে রিক্ত করা, এইসবেরই শোধ প্রকৃতি নেবেই একদিন।"[২০]

৩

ভাষা হচ্ছে একটি জাতি বা গোষ্ঠীর প্রধান সাংস্কৃতিক অবলম্বন। আদিবাসী ভাষা ও সংস্কৃতি আদিবাসী ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। আদিবাসীদের মধ্যে মোটামুটি ৩৪ রকম বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত। কিন্তু এই ৩৪টি বিভিন্ন ভাষা মূল-ভাষা নয়, প্রায় সবগুলিই ২টি প্রধান মূল-ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন উপভাষা বা ডাইলেক্ট মাত্র। সুদূর অতীত থেকেই বিভিন্ন নৃগোষ্ঠী এবং ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ ভারতে প্রবেশ করেছে এবং এই দেশের জনসংখ্যা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভারতের ভাষাসমূহকে মূলত চারটি প্রধান ভাষাগোষ্ঠীতে ভাগ করা হয়েছে:

১. ইন্দো-ইউরোপিও ভাষাগোষ্ঠী:

ইন্দো-ইউরোপিও ভাষাগোষ্ঠী ভারতের বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠীর উদাহরণ আদিবাসী সমাজে নেই।

২. দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠী:

দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠী দ্বিতীয় বৃহত্তম ভাষাগোষ্ঠী। দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ মূলত দক্ষিণ ভারত ও মধ্য ভারতে দেখা যায়। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এরা দ্রামিড় বা দ্রাবিড় ভাষাবংশজাত। এই ভাষাগোষ্ঠীর উদাহরণ ইরুলা, টোডো, ওঁরাও ও খোন্দ প্রভৃতি।

৩. অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠী:

© Santiniketan Sahityapath

হিমালয়ের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণ ভারত ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এই ভাষাগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। অস্ট্রো-এশীয় ভাষা মূলত 'অস্ট্রিক ভাষা'। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভাষায় নাম দিয়েছেন 'নিষাদ' ভাষাবংশ। ভারতে এই ভাষার প্রধান ভাষা হলো মুণ্ডারী। মুণ্ডারী ভাষা থেকেই সাঁওতাল, মুণ্ডা, হো, মাহালি প্রভৃতি ভাষার জন্ম।

৪. তিব্বতি-বর্মী ভাষাগোষ্ঠী:

হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে এই ভাষাগোষ্ঠীর বসবাস। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ভাষাবংশকে 'কিরাত' বলেছেন। তিব্বতি-বার্মা ভাষাগোষ্ঠীর উদাহরণ লেপচা, টোটো, মিরি গারো প্রভৃতি।[২১]

ভারতবর্ষে অস্ট্রো-এশীয় ভাষাগোষ্ঠীর আবার দুটি শাখা:

১. মুণ্ডারী শাখা: এই মুণ্ডারী শাখার ৭টি উপভাষা আছে। ছোটনাগপুর, মধ্যভারত ও উত্তরভারতে আদিবাসীদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত।

২. মন-খমের শাখা: এই মন-খমের শাখার ৯টি উপভাষা বা ডাইলেক্ট আছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আদিবাসীদের মধ্যে এই ভাষা প্রচলিত।

ভারতের আদিবাসী গোষ্ঠীগুলি বিস্ময়কর রকম বিপুলসংখ্যক ভাষায় নিজেদের প্রকাশিত করে চলেছে। ভারতের আদিবাসীদের বুঝতে গেলে তাদের ভাষা এবং সাহিত্যের গুরুত্বকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। তাদের ধারণা এবং কল্পনাকে বুঝতে গেলে তাদের ভাষা প্রতি দায়বদ্ধ হতে হয়। বলাবাহুল্য, তাদের ভাষা ভয়ংকর প্রতিকূলতার মুখে এসে পড়েছে এবং প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা যাচ্ছে। এরই প্রেক্ষিতে বাংলা উপন্যাসে উক্ত দুটি গানের উদাহরণ রেখে আদিবাসী ভাষা পরিচয় দেব, যেখানে ব্যক্ত হয়েছে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায় তাদের সুখ-দুঃখের নানা অনুষঙ্গ। যেমন, কালিপদ ঘটকের 'অরণ্য কুহেলী' (১৯৫৪) উপন্যাসে দুলালীর দ্বিতীয় স্বামী নুলো মাঝির জীবন অভিজ্ঞতা থেকে গীত গানটি। গানটি কুড়মী সম্প্রদায়ভুক্ত কুড়মালী ভাষায় রচিত:

"সাঁওতালী মহুলী পাক। ডেমু খাওয়ালি,
ভাসুরকে ভাত দিতে ঝুমুক দেখালি-
ও তুই ঝুমুক দেখালি।
দিলি কুলে কালি-ও তোর মুখে কালি,
হলি কলঙ্কিনী সবার চোখের বালি,
হায় হায় চোখের বালি"[২২]

দ্বিতীয়টি হলো: বুদ্ধদেব গুহর 'গামহারডুংরী' (১৯৬৬) উপন্যাসে হিন্দি-মেশা বিহা-গীতি:

"আয়ো ঘরে বাবা ঘরে।
রিঙ্গিচিঙ্গি-চিকনপিণ্ডা
ছুটত নই আওয়ে
বাপকা প্রেমসে, ভাইকা প্রেমসে ছুটত নই আওয়ে।"[২৩]

পরিশেষে এসে বলা যায়, ভারতীয় জ্ঞানব্যবস্থায় বিচিত্র জাতি-উপজাতির মিলিত চিন্তারাশি, চেতনাপ্রবাহ, ধ্যান-ধারণা একাকার হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে গৌরব ও বৈচিত্র্য দান করেছে। আর সেই ঐতিহ্যে ভিত্তি অনেকাংশে স্থাপিত হয়েছে ভারতীয় আদিম জনগণের দেশজ চিন্তাধারার দ্বারা। সেকারণে আদিবাসী ভারতীয় চিন্তাধারার পুনরাবিস্কার বা অনুসন্ধান যা শুধুমাত্র আদিবাসী সমাজের জন্য নয়, সমগ্র ভারতীয় সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। বলাবাহুল্য, আদিবাসী সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতির মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারলে অবশ্যই ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রটি আরো সমৃদ্ধ হবে।

তথ্যসূত্র:

১। ‘Tribal Religion Religious Beliefs And practices Among The Santal’, Troisi J, Manohor, 2021, p. 23
২। ‘An Introduction to Anthropology’, Morgan L. H, 1972, Sage Publication, Intruduction
৩। ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (১ম খণ্ড)’, বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ২০১১, পৃ. ১
৪। ‘বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ’, দেবসেন সুবোধ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, জানুআরি, ২০১০, পৃ. ২১
৫। ‘উত্তরবঙ্গের আদিবাসী’, বিমলেন্দু মজুমদার, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৮
৬। ‘ভারতের আদিবাসী’ সুবোধ ঘোষ, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ১০
৭। ‘পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ (১ম খণ্ড)’, ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৭
৮। ‘ভারতীয় আদিবাসী’, অমলকুমার মণ্ডল, দেশ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২৩
৯। ‘ভারতের আদিবাসী’, সুবোধ ঘোষ, ন্যাশানাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৪৮, পৃ. ৭৮
১০। ‘ভারতের আদিবাসী’, নৃতাত্ত্বিক ফন আইকস্টেট-ঘোষ সুবোধ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ, কলকাতা, ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৭
১১। ‘গামহারডুংরি’, বুদ্ধদেব গুহ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬, কলকাতা, পৃ. ২৩
১২। ‘শালপিয়ালের বন’, শক্তিপদ রাজগুরু, অভ্যুদয় প্রকাশনী, ১৯৫৪, কলকাতা, পৃ. ২
১৩। ‘ধর্মবিশ্বাস বৃক্ষপূজা দেবদেবী’, সুহৃদকুমার ভৌমিক (সম্পাদিত), টেরাকোটা, ১৩৯৩, বিষ্ণুপুর, প্রস্তাবনা অংশ
১৪। ‘গামহারডুংরি’, বুদ্ধদেব গুহ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬, পৃ. ২৬
১৫। ‘পূর্বপার্বতী’, প্রফুল্ল রায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৫, কলকাতা, পৃ. ৯৫
১৬। ‘শাল পিয়ালের বন’, শক্তিপদ রাজগুরু, অভ্যুত্থান প্রকাশনী, ১৯৫৪, কলকাতা, পৃ. ৬১
১৭। ‘দণ্ডক-শবরী’, নারায়ণ সান্যাল, গ্রন্থপ্রকাশ, ১৯৬১, কলকাতা, পৃ. ২১৪
১৮। ‘পূর্বপার্বতী’, প্রফুল্ল রায়, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৫, কলকাতা, কলকাতা, পৃ. ৪
১৯। ‘হাঁসুলীবাঁকের উপকথা’, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সূচয়নী পাবলিশার্স, ১৯৪৮, কলকাতা, পৃ. ৪
২০। ‘গামহারডুংরি’, বুদ্ধদেব গুহ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬, কলকাতা, পৃ. ৮৬
২১। J. Biosci., Vol. 28, No. 4, June 2003, 507–522, © Indian Academy of Sciences
২২। ‘অরণ্য কুহেলী’, কালীপদ ঘটক, পূর্ণবঙ্গ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৪৩
২৩। ‘গামহারডুংরি’, বুদ্ধদেব গুহ, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৬, কলকাতা, পৃ. ৪৩

—

© Santiniketan Sahityapath